কালের কণ্ঠ

09 JUN 2017

তারিখ ... ~~11 JUN 2017~~
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৬...

বোর্ডের পরীক্ষায় পাসের হার 'মাতৃস্নেহে খাতা দেখবেন'

সেলাই করা খোলা মুখ

মোফাজ্জল করিম

যদি আবার দেখা যায় শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ কাগজের ওপর ১৫% ভ্যাট বসানো হচ্ছে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন জাগে। অবশ্য এদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই বোধ করি এমন। নইলে গরিবের প্লাস্টিক স্যান্ডেল, বাচ্চাদের বলপেন, বস্তির মানুষের প্লাস্টিকের বালতি, মগ, ঘটিবাটির দিকে নজর যাবে কেন? এগুলোর ওপর 'ট্যাক্সো' না বসালে কি সরকারের বিরাট সংসারের চাকা সত্যি অচল হয়ে যাবে? হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংকডাকাতি, লুটপাট, তসরুফ—এসবের বিষয়ে মুখে রা-টি নেই, টানাটানি শুধু শিক্ষার উপকরণ ও গরিবের স্যান্ডেল নিয়ে

আমার এক ভাগ্নি এক কলেজে অধ্যাপনা করে। বছর কয়েক আগে সে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তার বিষয়ের পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল। সে সেদিন আমাকে বলল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার খাতা কিভাবে দেখতে হবে সে সম্পর্কে পরীক্ষকদের ডেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ওই সভায় তারা একটা কথা. নাকি খুব জোর দিয়ে বলে, খাতা দেখবেন খুব 'লিবারেলি', পরীক্ষার্থীকে পাস করানোর উদ্দেশ্যে, ফেল করানোর উদ্দেশ্যে নয়। যে কোনো প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষার্থী কলম ছোঁয়ালেই তাকে কিছু হলেও নম্বর দিতে হবে, 'জিরো' দেবেন না। একজন নারী পরীক্ষক যখন জানতে চাইলেন, উত্তর ভুল হলে নম্বর দেব কী করে, তখন সেই কর্তাব্যক্তি নাকি রসিকতা করে বলেন, আপনারা মায়ের জাতি, মাতৃস্নেহে নম্বর দেবেন। এর পর থেকে আমার ভাগ্নি আর বোর্ডের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করে না। শুনে আমি বললাম, কেন রে? খাতা দেখবি না কেন? তোর মধ্যে কি মাতৃস্নেহ নেই? না, অন্যের সন্তানের প্রতি স্নেহবর্ষণে তোর অনীহা আছে? সে বলল, মামা, মাতৃস্নেহের আদিখ্যেতায় একটি সন্তান মানুষ না হয়ে অমানুষ কি বনমানুষ হোক—এটা নিশ্চয়ই আপনি আমি কেউ চাইব না। ছিঃ!

এই ছিঃ-এর পর আর কথা চলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষাধিপতিদের তাতে কিছু যায় আসে না। তারা দাতা হাতেম তায়ীর মত দু'হাত দু'পা ঝেড়ে হরিলুটের বাতাসার মত পরীক্ষকদের হাত দিয়ে নম্বরের বাতাসা বিলান প্রত্যেক পাবলিক পরীক্ষার পর। ফলে আমাদের দেশে ওসব পরীক্ষা পাসের হার মাশাআল্লাহ উন্নয়নের জোয়ারের মঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিরন্তর ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

দুই.

এ প্রসঙ্গে বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন পাঠকের অবগতির জন্য একটা তথ্য দেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে। স্বাধীনতাপূর্বকালে এসএসসি, এইচএসসি (ষাটের দশকের আগে এগুলোর নাম ছিল যথাক্রমে ম্যাট্রিকুলেশন বা ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট) পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৪০-৫০-এর বেশি ছিল না। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত—অর্থাৎ আমাদের সময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তা কখনও ৪০/৪২ পেরিয়েছে বলে মনে পড়ে না। তার মানে কী? তার মানে কি এই যে তখনকার শিক্ষার্থীরা সব মেধাশূন্য ছিল? তারা লেখাপড়া না করে দিনরাত কেবল ফাড্ডাবাজি করে বেড়াত? নাকি পরীক্ষকদের মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহ তো ছিলই না, বরং তারা সবাই ছিলেন ডাইনি পিশাচ? এমনটি ভাবাও বোধ হয় পাপ। কারণ সে আমলে শত-সহস্র নমস্য শিক্ষক, প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত এ দেশে শিক্ষাদানে শিক্ষাবিস্তারে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় অতুলনীয় অবদান রেখে গিয়েছিলেন বলেই প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে দেশে শিক্ষার প্রসার লাভ হয়েছে। তখন আজকের মত বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উন্নতি ঘটেনি বলে জ্ঞানের জগতে হয়ত অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষা হতো, তাতে কোনো খাদ বা ফাঁক-ফোকর ছিল না। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, প্রশ্নের উত্তর লিখে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারি সার্কুলারের মত তা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, 'মাতৃস্নেহে' পরীক্ষার খাতা দেখা এসব 'চিকনগুনিয়া' রোগের নামও তখন শোনা যায়নি। জানি না, কালে কালে আরও কত 'চিকনগুনিয়া' 'মোটাগুনিয়া' ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে এ দেশে।

পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার ৯০/৯৫ পারসেন্ট হওয়াতে অভিভাবকরা খুশিতে ডগমগ হন, মিষ্টির দোকানগুলোতে বিক্রি-বাট্টা হুড়মুড় করে বেড়ে যায়, আমাদের শিক্ষাধিপতিরা তৃপ্তির (চুকা) ঢেকুর তোলেন, কিন্তু বাংলাদেশের চোখ ফেটে জল আসে।

কেন? কারণ এসএসসি-এইচএসসি পাস করে শিক্ষার্থীটি যদি পৃথিবীর কোনো ভাষায় দু'লাইন শুদ্ধভাবে লিখতে কিংবা দুটো কথা ঠিকমত গুছিয়ে কইতে না পারে, তাহলে সে পাস দিয়ে কী হবে। এক ঢাকাইয়া বুড়ো ভদ্রলোক সে আমলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণি পেয়ে এমএ পাস করেছিলেন। তাঁর নাতি মানবিক শাখায় জিপিএ ৫ পেয়ে নাচতে নাচতে এসে দাদাকে রেজাল্ট জানাল। দাদা কথায় কথায় নাতির বিদ্যার বহর যাচাই করার জন্য জানতে চাইলেন, বল দেখি, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? নাতি চুপ করে আছে দেখে দাদা রেগে গিয়ে বললেন, এই নাকি তোর জিপিএ ৫? ঠিক আছে, তোর বাপের নাম কী বল তো? নাতি জবাব দিল, দ্যাখো দাদা, এভাবে প্রশ্ন করলে তো হবে না। তুমি তিন/চারটা নাম লিখে দেবে। তখন আমি একটাতে 'টিক' চিহ্ন দিয়ে বলব—এটা আমার বাবার নাম। এটাই আধুনিক এমসিকিউ পদ্ধতি। এভাবে জানতে চাইবে তুমি। তা না করে হুট করে বাবার নাম জিগ্যেস করলে হাজার হাজার নামের মধ্যে কোনটা আমার বাবার নাম কী করে বলব? শুনে বুড়ো দাদুর তো টাসকি লাগার জোগাড়। তিনি মুখে 'নাতি হালায় কয় কী' বলে এক দৌড়ে বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

তিন.

পাসের হার ৯০ আর জিপিএ ৫-এর ছড়াছড়ি দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ যতই তৃপ্তির (চুকা) ঢেকুর তুলুন না কেন, আর দেশে-বিদেশে বাহবা কুড়ানোর হাস্যকর চেষ্টা করুন না কেন, এটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা, এতে যে অচিরেই জাতি খেসারত দিতে শুরু করবে তা কে বোঝাবে তাঁদের। হ্যাঁ, জাতি দিন দিন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই হাইওয়েতে তো আর রিকশা-ঠেলাগাড়ি-ভ্যানগাড়ি চড়ে দেশ এগোবে না, তাকে কমসে কম হাজার হাজার মোটর কার, ট্রাক-বাস চালিয়ে পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু সেই গাড়ি চালানোর দক্ষ ড্রাইভার-হেলপার কোথায় পাব আমরা, যদি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কেবল পারসেন্টেজ প্রদর্শনের মোহ নিয়ে পড়ে থাকি? আমরা না হয় অবোধ পাবলিক, আমাদের তোমরা 'যেমনি নাচাও, তেমনি নাচি', আমরা কিছু বুঝি না, বলি না, কিন্তু দেশে সত্যিকারের মনীষী ব্যক্তির কি আকাল পড়েছে? তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন তো তাঁরা কী বলেন আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে। স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার হার বোধ হয় শতকরা মাত্র ২৪/২৫ ছিল। সেটা এখন দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে ৭০ ছাড়িয়ে গেছে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এর কৃতিত্ব কোনো একটি সরকারের নয়। গত চার দশকের নানাবিধ উদ্যোগ ও কৌশল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি ব্যাপক গণসচেতনতা, বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলে, এই সাফল্য বয়ে এনেছে। এর ফলে অন্তত নাম দস্তখতটা এখন সমাজের নিচু স্তরের বেশির ভাগ মানুষ করতে পারে। শিক্ষার নিম্নতম স্তরে বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেসব অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও মৌলিক সমস্যা আবহমানকাল ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজ করছে, সেগুলো দূর করতে সব কিছু ঢেলে সাজালে আজকের শুধু নাম দস্তখতসর্বস্ব সাক্ষর মানুষগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আপাতত, হ্যাঁ, আপাতত 'কোয়ালিটির' চেয়ে 'কোয়ান্টিটির' দরকার আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অর্থাৎ পিএসসি-জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি—এগুলোতে অবশ্যই কেবল সংখ্যা নয়, গুণগত মানের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ এরপরই তো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হয়ে একজন শিক্ষার্থী তার ১০/১২ বছরের পরিশ্রমলব্ধ অধীত বিদ্যা নিয়ে প্রবেশ করবে জ্ঞানের মহাসমুদ্রে। ওই পর্যায়ে (ইংরেজিতে যাকে বলে টার্শিয়ারি লেভেল, সোজা কথায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়) গিয়ে স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে অবগাহন করতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে আগের পর্যায়গুলো থেকে। অন্যথায় একের পর এক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরঙ্গমালা এসে তাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অকূল পাথারে, কোথা থেকে কী হচ্ছে সে বুঝতেও পারবে না। আর কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যেনতেন প্রকারেণ 'গার্বেজ-ইন, গার্বেজ আউট' ফর্মুলায় প্রতিবছর এত হাজার গ্র্যাজুয়েট, এত হাজার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দেশে 'উৎপাদিত' হবে এবং সেই সংখ্যা বছর বছর বাড়তেই থাকবে, আর এই অষ্টরম্ভা দেশের মানুষ ও বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে 'শাব্বাশি' আদায় করবেন এবং ওটাই হবে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তা হলে সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যেসব রোগী মরার কথা নয় তাদের মৃত্যুহার বাড়তেই থাকবে, যে ব্রিজ-কালভার্ট দুই-দশ বছরে কিস্সু হওয়ার কথা না, সেগুলোতে দুমাস পরেই ফাটল ধরবে, ভেঙ্গে পড়বে, যে প্রশাসক দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার কথা সে হয়ে যাবে দুর্নীতি-দুঃশাসনের দুর্বার সেনানী।

চার.

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। সরকারও তা মানে। এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার হয়ত আন্তরিক। কিন্তু গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে যেমন গাছকে বাঁচানো যায় না, তেমনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সকল পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যেসব মৌলিক সমস্যা রয়েছে, সেগুলোর সমাধান না করে যাই করা হোক না কেন, তা 'উইন্ডো ড্রেসিং' বলেই মনে হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি যুগোপযোগী, তার ভিত, অর্থাৎ প্রাইমারি পর্যায়, কি জগদ্দল উপরিকাঠামোকে ধরে রাখার সামর্থ্য রাখে, শহরাঞ্চল ও তার থেকে এক শ গুণ বড় গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার মানের যে বিশাল পার্থক্য, তা দূর করার আদৌ কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে কি—এসব প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে শুধু ফুটো কলসিতে পানি ঢালার মত বিনিয়োগের কড়ি ঢাললে তা থেকে লাভবান হবে তারাই, যারা চিরকাল সরকারি প্রজেক্টের দুটো কাঁচা পয়সা হাতিয়ে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার মধ্যে যদি আবার দেখা যায় শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ কাগজের ওপর ১৫% ভ্যাট বসানো হচ্ছে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন জাগে। অবশ্য এদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই বোধ করি এমন। নইলে গরিবের প্লাস্টিক স্যান্ডেল, বাচ্চাদের বলপেন, বস্তির মানুষের প্লাস্টিকের বালতি, মগ, ঘটিবাটির দিকে নজর যাবে কেন? এগুলোর ওপর 'ট্যাক্সো' না বসালে কি সরকারের বিরাট সংসারের চাকা সত্যি অচল হয়ে যাবে? হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংকডাকাতি, লুটপাট, তসরুফ—এসবের বিষয়ে মুখে রা-টি নেই, টানাটানি শুধু শিক্ষার উপকরণ ও গরিবের স্যান্ডেল নিয়ে। সরকারকে ডোবানোর জন্য কোনো বিভীষণ তলে তলে কাজ করছে কি না কে জানে।

লেখক : সাবেক সচিব, কবি
mkarim06@yahoo.com